রউফুর রহীম

নবিজীবনের বিশুদ্ধ ও বিস্তারিত গ্রন্থনা

(২য় খণ্ড)

ড. ‘আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদ

মাহমুদুল হাসান
ফখরুল ইসলাম
হাসান শুয়াইব

সম্পাদনা

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

রউফুর রহীম : ২য় খণ্ড

ড. 'আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২১ সিয়ান পাবলিকেশন

প্রথম বাংলা-সংস্করণ
১৪৪২ হিজরি। ডিসেম্বার ২০২১
ISBN: 978-984-8046-05-0

মূল্য: ৭৭০৳ মাত্র।

www.seanpublication.com
+88 01781 183 501

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট-মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি অথবা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন-সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে চৌর্যবৃত্তিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

'Raufur-Rahim: Volume-2 An Authentic and Detailed account on the Life of Prophet ﷺ', the Bengali version of the book 'Seeratun-Nabawiyah' by Dr. Ali Muhammad As-Sallabi, Translated by Fakhrul Islam, Mahmudul Hasan and Hasan Shuaib, Edited by Abu Tasmiya Ahmed Rafique, published by Sean Publication Limited, Bangladesh.

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
ইসলামি টাওয়ার, ২য় বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮০ ১৭৫ ৩৩ ৪৪ ৮১১

সূচিপত্র

- সম্পাদকের কথা ১১
- মাদীনায় হিজরাত ১৭
  - হিজরাতের পূর্ব-প্রস্তুতি ১৭
  - মুহাজিরদের সাদরে গ্রহণ এবং মু'মিনদের অন্তরে এর প্রভাব: ৩২
  - ইসলামি রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে মাদীনাকে বেছে নেওয়ার কারণ: ৩৮

৪৪ রাসূল ﷺ-ও আবু বাক্‌র সিদ্দীকের হিজরাত

- রাসূল ﷺ-কে গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র: ৪৫
  - শিক্ষা ও উপকারিতা: ৬০
    - মুহাজিরদের পুরস্কার ও পেছনে রয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের প্রতি ধমক: ৮৪

৯৪ মাদীনায় ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তিস্থাপন

- মাদীনায় ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তিস্থাপন: ৯৫
  - সারকথা ও শিক্ষা ১০৫
  - আরও কয়েকটি উপকারিতা ও শিক্ষা ১০৭
  - কিছু উপকারী কথা ও শিক্ষা ১০৮
  - মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতীক ১০৯
  - কিছু শিক্ষা ও কিছু উপকারিতা ১১৫
- মানবীয় মূল্যবোধ ও মহান আদর্শ ১২২
  - মুহাজির, আনসার ও ইয়াহূদিদের মাঝে রাসূলের চুক্তি স্বাক্ষর ১২৬

  - সনদের উপকারিতা ও শিক্ষা ১৩১
  - নবি ﷺ ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার ১৫২
  - প্রতিরক্ষা-নীতি ও সমরাভিযান ১৭১
  - প্রশিক্ষণ কৌশলে রাসূলের দিক-নির্দেশনা প্রদান ১৭৪
  - আল্লাহর পথে সশস্ত্র জিহাদের লক্ষ্য: ১৭৫
  - আবওয়া অভিযান ১৮৪
  - প্রথম বদরযুদ্ধ ১৮৬
- কিছু শিক্ষা, কিছু অর্জন ১৮৭
  - বনু জামরাহ গোত্রের সঙ্গে চুক্তিপত্রের মূল কথা ও পর্যালোচনা ১৮৯
  - আল্লাহর পথে প্রথম ধনুক নিক্ষেপকারী ১৯০
  - কথা বলার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র রাসূলের অনন্য নীতি ২০০
  - রাসূলের কয়েকটি মহান আদর্শ ২০৫
  - রাসূলের সময়-সুযোগ বুঝে শালীনভাবে প্রশ্ন করা ২১৩
- কিছু ঘটনা, কিছু বিধান ২১৩

২১৮ **ঐতিহাসিক বদরযুদ্ধ**

- যুদ্ধপূর্ব কয়েকটি খণ্ডচিত্র ২১৯
- বদর প্রান্তরে রাসূল ﷺ ও সাহাবিগণের অবস্থান ২৩৩
  - রণাঙ্গনের কিছু চিত্র ও ঘটনা ২৫০
  - কয়েকজন শহিদের ঘটনা ২৫৭
  - গানীমাত ও বন্দিদের ব্যাপারে মতবিরোধ ২৬০
  - বদরযুদ্ধের ফলাফল ও রাসূলকে গুপ্তহত্যার চেষ্টা ২৭৮
- বদরযুদ্ধের কয়েকটি শিক্ষা, উপদেশ ও উপকারিতা ২৮৬
  - বদর ও উহুদ-মধ্যবর্তী কয়েকটি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ২৯৯
  - ইসলামি রাষ্ট্রের বিদ্রোহীদের নির্মূল ৩০৯
  - কয়েকটি সামাজিক ঘটনাবলি ৩১৯

৩২২ উহুদযুদ্ধ

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও কারণসমূহ ৩২৩
- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুদ্ধপরিকল্পনা: ৩৩৬
- শুরু হলো যুদ্ধ ৩৩৯
- উহুদের আলোচিত শহিদেরা ৩৪৮
- কিছু নবুওয়াতি নিদর্শন ৩৬৩

যুদ্ধ-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ ৩৬৫
- নারী সাহাবিয়াদের ধৈর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত ৩৭২
- উহুদযুদ্ধ: শিক্ষা ও ইতিবাচক দিকসমূহ ৩৭৮
- তিরন্দাজ বাহিনী ও মুনাফিকদের সঙ্গে নবিজির আচরণ ৩৮৬

৩৯০ উহুদ ও খন্দক মধ্যবর্তী সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

ইসলামি রাষ্ট্র ধ্বংসে মুশরিকদের সমূহ অপতৎপরতা: ৩৯১
- নবিজির দু'টি বিয়ে এবং অন্যান্য বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ৪১০
- গাযওয়া: যা-তুর রিকা ৪৩৬
- প্রতিশ্রুত বদরযুদ্ধ ও দাওমাতুল জান্দাল ৪৪২

গাযওয়া বনু মুসতালিক ৪৪৭

বনু মুসতালিক যুদ্ধ ও ইফকের ঘটনা থেকে পাওয়া কতিপয় শিক্ষণীয় বিষয় ৪৭৪

প্রান্তটীকা ৪৭৮

সম্পাদকের কথা

֍ আমার এক বন্ধুর বাবা, যুক্তরাজ্যের বাসিন্দা। ভদ্রলোক সব সময় টুপি পরে থাকেন, দাড়িও রেখেছেন; নামাজ-কালাম পড়েন, দান-সাদাকাও করেন বেশ। দেশে এলে মাঝেসাঝেই আমার সঙ্গে নানান বিষয়াদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। একদিন আলোচনার একপর্যায়ে তার মনের গভীরে প্রোথিত কিছু বিষয় বেরিয়ে আসে। বিষয়টি হলো, মাদীনার ইহুদি গোত্র বানু কুরাইযাকে নবি মুহাম্মাদ কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড প্রদান। এটা নিয়ে তার প্রবল আপত্তি! আপত্তির হাঁড়ি যখন ভাঙল, আরও অনেক কিছু বেরিয়ে এল। এই যেমন মা-বাবার চেয়েও কেন নবিজিকে বেশি ভালোবাসতে হবে; পালক ছেলের বৌকে বিয়ে ইত্যাদি!

এমন রোগে আক্রান্ত অনেক রুগীর সঙ্গে আমার এই জীবনে অনেকবার কথা হয়েছে। তাই আমার বুঝতে বাকি ছিল না এর গোড়া কোথায়, আর কোথায়ই-বা শেষ। আমি তাকে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে। তবে তিনি স্পষ্ট হয়েছেন কি না তা নিয়ে আমার শক্ত সন্দেহ রয়ে গেছে। একটু সংশয়াপন্ন অবস্থা দেখা গেলেও দৃশ্যত তিনি তার মত পরিত্যাগ করেননি। কী আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না? দাড়ি-টুপি, সালাত-সিয়াম, দান-সাদাকা সবই আছে, অথচ ঈমানটাই নেই!

হাজ্জের সফরে ছিলাম। একদিন আসরের পর মাত্বাফে বসে একাগ্রচিত্তে তাকিয়ে আছি আল্লাহর ঘরের দিকে। পাশ থেকে এক ভদ্রলোকের সালামে সম্বিত ফিরে এল। জানলাম, তিনিও বাংলাদেশি; এটা তার দ্বিতীয় হাজ্জ। এক কথা দু কথায় আমাদের আলাপ জমে উঠল। একপর্যায়ে হাজ্জ আর বাইতুল্লাহ নিয়ে তার মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা নানা সংশয় বাইরে বেরিয়ে পড়তে লাগল। আমি যখন কিছুটা পালটা যুক্তি দিলাম, অকপটে তিনি বলেই ফেললেনে, 'আমি একটা ঘরকে ঘিরে এভাবে প্রদক্ষিণ করার সাথে মূর্তিপূজার তেমন কোনো পার্থক্য খুঁজে পাই না!' শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম! ডাবল হাজি সাহেব; কিন্তু ঈমান নেই!

একটি হাদিসের এমন ভাষ্য আমরা এমনটা শুনেছি যে, একজন মানুষ জান্নাতের পথে চলতে থাকবে। চলতে চলতে তার আর জান্নাতের মাঝে সামান্য ব্যবধান থাকবে। তখন সে এমন কাজ করবে, যা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। হাদিসে এ ধরনের বক্তব্য শুনে কারও কারও মেনে নিতে কষ্ট হয়; ভাবে, এটা কেমন কথা! কিন্তু আল্লাহর রাসূলের কথা তো আর ভুল হতে পারে না।

আমরা নিজেদেরকে ঈমানদার দাবি করতে ভালোবাসি; কিন্তু আমাদের কারও অন্তরে এমন কোনো সন্দেহ-সংশয় রয়ে গিয়েছে কি না তা বলা যায় না। কিংবা যে বিষয়গুলোকে ঈমানের জন্য পূর্বশর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেগুলো আমরা হয়তো ঠিকমতো জানিই না। আর সে কারণে কুফরি মনের কোণে ঘাপটি মেরে আছে কি না, তাও হয়তো আমরা টের পাই না; কিন্তু যদি থেকেই থাকে, মৃত্যুর পূর্বের সেই কঠিন সময়ে তা নিশ্চিত বেরিয়ে আসবে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন!

নবিজিকে মাতা-পিতা, সন্তানসন্ততি, ভাইবোন, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ-সম্পদ, ঘরবাড়ি—সবকিছু থেকে, এমনকি নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতে হবে—এটা ঈমানের শর্ত; এটা ছাড়া ঈমান যে গ্রহণযোগ্যই নয়, তা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু কত জন সত্যিকারভাবে নবিজিকে সবার চেয়ে, সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসতে পেরেছি, তা কেউ না জানলেও আল্লাহ ঠিকমতোই জানেন।

আল্লাহর ভালোবাসা উপলব্ধি করা আর রাসূলের ভালোবাসা উপলব্ধি করার মধ্যে কিছুটা তফাত আছে। কারণ, মানুষ যে দিকে চোখ ফেরায়, আল্লাহর কুদরত নিজ চোখে দেখতে পায়। তাই আল্লাহকে সর্বোচ্চ ভালোবাসা দেওয়ার যৌক্তিকতা সহজেই খুঁজে পায়; কিন্তু ১৪ শ বছর পূর্বে আগত একজন মানুষকে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসার যৌক্তিকতা এত সহজে উপলব্ধি করা যায় না।

এই যৌক্তিকতা কেবল তখনই উপলব্ধি করা যাবে, যখন আমরা জানব—আমাদের জন্য নবি মুহাম্মাদ ﷺ কী অবদান রেখেছেন, কী কষ্ট করেছেন, কী ত্যাগ তিনি স্বীকার করেছেন।

ইতিহাসের পাতা চিরে চিরে এই গ্রন্থটি সেই চিত্রই তুলে ধরবে আমাদের সামনে।

নবিজির জীবনীগ্রন্থ আন্তরিক অধ্যয়নের মাধ্যমে তাঁর প্রতি ভালোবাসার সূত্রপাত হবে। যত বিস্তারিত জানব, ভালোবাসার অনুভূতি তত গভীরতা লাভ করবে।

এরপর সেই ভালোবাসাকে জীবনের অন্য সবকিছুর ওপরে স্থান দেওয়ার জন্য আমাদেরকেও ভালোবাসার দাবি পূরণ করতে হবে। কেবল জানার মাধ্যমে এ দাবি পূরণ

হবে না। এ ভালোবাসাকে জীবনে সবকিছুর ওপর স্থান দিতে হলে আমাদেরকেও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। অন্যান্য ভালোবাসা যেমন ত্যাগের মধ্য দিয়ে নিখাদ ও গভীর হয়, তেমনই নবিজির ভালোবাসাকে সবকিছুর ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে হলেও ত্যাগের বিকল্প নেই। ত্যাগ স্বীকার করতে হবে সেই নবির আনীত দীনের জন্য, তাঁর প্রাণপ্রিয় উম্মাহর জন্য।

আমরা যখন সেই নবির আনীত দীনের ঝান্ডা সমুন্নত রাখার জন্য অবদান রাখব, দীনের জন্য জানমালের কুরবানি করব, ব্যক্তিগত-পারিবারিক, সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে তাঁর আনীত দীনের বাস্তবায়ন করব; যে উম্মাতের কল্যাণ সাধনে নবিজি তাঁর গোটা জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, সেই উম্মাতের নিরাপত্তা রক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে সাধ্যমতো ভূমিকা রাখব; দৈনন্দিন যাপিত জীবনে তাঁর আদর্শের চর্চা করব, তখনই তাঁর ভালোবাসা আমাদের অন্তরে স্থায়ী শেকড় গাড়বে, অন্য সকল ভালোবাসার ওপর স্থান লাভ করবে; ঠিক যেভাবে প্রতিনিয়ত আদর-যত্ন, স্নেহ-ভালোবাসা ও প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে সন্তানের জন্য বাবা-মায়ের হৃদয়ে ভালোবাসা গভীর থেকে গভীরতর হয়।

◆ মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে তাঁর প্রিয় রাসূলকে বেশ কিছু নামে উল্লেখ করেছেন। নবিজি তাঁর উম্মাতের প্রতি যে দরদ ও মায়া-মমতা দেখিয়েছেন, তার সবচেয়ে অধিক প্রতিফলন ঘটেছে দুটো নামের মধ্যে—‘রউফ’ ও ‘রহীম’। এ নাম দুটি আল্লাহর আসমাউল হুসনা’র অন্তর্ভুক্ত। শুরুতে ‘আলিফ লাম’ যুক্ত করলে কেবল আল্লাহর শানেই ব্যবহার্য। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এ নামে উল্লেখ করা দ্বারা বোঝা যায়, এই উম্মাতের প্রতি মহান স্রষ্টার পর তাঁর নবির দরদ ও অবদানই সবচেয়ে বেশি। তাই আমরা তাঁর সীরাত গ্রন্থটিকে *রউফুর রহীম* নামে নামকরণ করেছি।

আল্লাহ এই বইয়ের লেখক, পাঠক ও এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আল্লাহর রাসূলের জন্য সর্বোচ্চ ভালোবাসা নিবেদনের তাওফিক দিয়ে ধন্য করুন।

◆ ড. সাল্লাবির লিখনীর সাথে যখন থেকে আমার পরিচয় তখনও ‘সিয়ান’-এর জন্ম হয়নি। সেই ২০০৭/৮ সালের কথা। তন্ময় হয়ে আরব এক শাইখের একটি লেকচার সিরিজ শুনতাম। যতক্ষণ শুনতাম মনে হতো যেন টাইম মেশিন রিওয়াইন্ড করে চৌদ্দশ বছর আগে ফিরে গিয়েছি। যেন হাঁটছি মাক্কা-মাদীনার অলিগলিতে। ঘুরে ফিরছি বাদ্‌র আর উহূদের প্রান্তরে।

এই লেকচার সিরিজে প্রায় প্রতিটি ঘটনার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও উপদেশগুলো তুলে ধরার সময় যাদের নাম অবধারিতভাবে এসে যেত, তাদের অন্যতম হলেন ড. সাল্লাবি। যতদূর জানি, সে সময়ে তার বইগুলো ইংরেজিতে প্রকাশ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। বক্তা

আরব হওয়ায় তিনি সাল্লাবির রচনার সাথে পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিলেন। বক্তা ও বক্তৃতার প্রতি ভালোবাসার সাথে সাথে অবচেতন মনে এই লেখকের লিখনির প্রতিও তৈরি হয়ে যায় গভীর এক ভালোবাসা।

‘সিয়ান’ শুরু করার পর যখনই ইসলামের ইতিহাস নিয়ে কাজ করার প্রসঙ্গ সামনে এসেছে, আমার প্রথম পছন্দ ছিলেন ড. সাল্লাবি। পরামর্শ-সভায় উত্থাপন, আলোচনা এবং নানা দিক খতিয়ে দেখার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আমরা ড. সাল্লাবির ইতিহাস সিরিজ নিয়েই কাজ করব।

‘সিয়ান’-এর তৎকালীন অন্যতম দায়িত্বশীল শরিফ আবু হায়াত অপু ভাইয়ের ওপর দায়িত্ব পড়ে যোগাযোগ স্থাপনের। তিনি মূল আরবি প্রকাশক লেবাননের দার আল মা’রিফার সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হন এবং প্রকাশক ও লেখক উভয়ের পক্ষ থেকে বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার লিখিত অনুমতিপত্র সংগ্রহ করেন।

এরপর আমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের সীরাত নিয়ে কাজ শুরু করি। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের অনুবাদক জনাব ফখরুল ইসলাম ভাই পূর্ণকালীন আরবি অনুবাদক হিসেবে সাল্লাবি প্রকল্পের কাজ শুরু করেন। আরও কয়েকজনকে খণ্ডকালীন কাজ দেওয়া হয়; কিন্তু তখন আকস্মিক সিয়ানের ওপর এমন এক ঝড় আসে যে, ঠিকমতো কোমর সোজা করে দাঁড়ানোর আগেই প্রচণ্ড এ ঝড়ে অনেক কিছু লন্ডভন্ড হয়ে যায়।

ঝড় থামার পর যখন আবার কাজ শুরু করলাম, তখন আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে কিছুটা পরিবর্তন এনে সীরাতুর-রাসূলের অনুবাদ প্রকাশের পূর্বেই খুলাফা’ আর-রাশিদূন পর্বটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। এর পেছনে যৌক্তিকতা ছিল, ঠিক এই মানের না হলেও সীরাতুর-রাসূলের ওপর বেশ কিছু ভালো বই বাংলা ভাষায় ইতোমধ্যেই রয়েছে এবং তা পাঠকের প্রয়োজন অনেকটা পূরণ করছে। কিন্তু খুলাফা’ আর-রাশিদূনের ইতিহাস নিয়ে বাংলা ভাষায় এক নামে রেফার করার মতো ভালো কোনো কাজই নেই। এই জায়গাটিতে বড় একটি শূন্যতা তৈরি হয়ে আছে। তাই আমরা সেটা আগে পূরণ করে এরপর সীরাতুর-রাসূল প্রকাশ করব। ইতিমধ্যে অন্যান্য কিছু প্রকাশনীও সাল্লাবির বইগুলো নিয়ে কাজ শুরু করায় আমাদের সেই চিন্তাটির আর তেমন বাস্তবতা রইল না। তাই আমরা আবার সীরাতুর-রাসূল এবং খুলাফা’ আর-রাশিদূন যুগপৎ প্রকাশ করার সিদ্ধান্তে ফিরে আসি।

❁ ইসলামের ইতিহাস নিয়ে কাজ করা এক সুবিশাল কর্মযজ্ঞ। বিশাল এই কাজে রয়েছে অনেকের অবদান। পর্দার পিছনেও এ প্রকল্পের সাথে যুক্ত আছেন অনেকে। সিয়ান টিমের প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বইগুলোর উৎকর্ষ বাড়াতে

তাদের কারও অবদানই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আল্লাহ তাদের সবার কষ্টটুকু কবুল করে নিন, উত্তম বিনিময় দিন।

প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর বাকি খণ্ড দু'টি প্রকাশের এই অনিচ্ছাকৃত ও অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্বের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার কারণেই এটা হয়েছে। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন!

মহান আল্লাহর সৃষ্টিই যে একমাত্র নিখুঁত—মানুষের প্রতিটি কাজই তার সাক্ষ্য বহন করে চলে। শতভাগ চেষ্টার পরও মানুষের কোনো কাজই নির্ভুল ও নিখুঁত নয়; ভুল থাকবে, আরও উন্নত করার সুযোগ থাকবে সব সময়ই। আমাদের এ কাজটিও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে আমরা আমাদের দিক থেকে চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখিনি।

আপনি পাঠক হিসেবে কোনো ভুল বা অসংগতি আপনার দৃষ্টিগোচর হলে ই-মেইল অথবা ফোনে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ করছি।

গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পথে আমাদের এই পথ চলায় আপনিও হোন আমাদের অংশীদার।

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

প্রধান সম্পাদক

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

নভেম্বর ১৩, ২০১১

মাদীনায় হিজরাত

হিজরাতের পূর্ব-প্রস্তুতি

মাদীনায় হিজরাতের আগে সুবিস্তৃত, সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত একটি প্রস্তুতিপর্ব ছিল। নবি ﷺ খুব সূক্ষ্মভাবে তা করেছিলেন। সর্বোপরি এটা অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক এবং সম্পন্ন হয়েছিল দুদিক থেকে; মুহাজিরদের মানসিক অবস্থা ও হিজরাতভূমি মাদীনাকে রাজনৈতিকভাবে তাদের উপযোগী করা নিয়ে।

মুহাজিরদের প্রস্তুতি

চিত্তবিনোদন কিংবা রিফ্রেশমেন্টের জন্য ঘুরাঘুরি বা বনভোজনের নাম হিজরাত নয়; বরং নিজ দেশ, পরিবার, আত্মীয়স্বজনের মায়া ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সবকিছুর মোহ ত্যাগ করে আল্লাহর জন্য অন্য দেশে পাড়ি জমানোর নাম হিজরাত। উপার্জনের আরও ভালো সুযোগের জন্যও নয়, আপন আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিরক্ষার খাতিরেই তাদের এ হিজরাত। তবে এটা সহজ কোনো ব্যাপার ছিল না। এর জন্য প্রয়োজন ছিল অনেক কষ্ট ও পরিশ্রমের, অনেক দীক্ষা, প্রশিক্ষণ আর প্রস্তুতির। শেষ পর্যায়ে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, এবার হিজরাত করা যেতে পারে। হিজরাত উপলক্ষ্যে মুহাজিরদের প্রস্তুতির কিছু নমুনা—

ক. অবিচল ঈমানের প্রশিক্ষণ; যার বিশদ আলোচনা আমরা প্রথম খণ্ডে করেছি।

খ. মু'মিনরা এমন এমন জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তারা নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, কাফির-মুশরিকদের সঙ্গে বসবাস করা আর সম্ভব নয়।

কুরআনের মাক্কায় অবতীর্ণ অংশে হিজরাতের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ ছিল। সে ইঙ্গিত বুঝতে মু'মিনদের বেগ পোহাতে হয়নি। কেননা পৃথিবীটা মাক্কাতেই সীমাবদ্ধ নয়; আল্লাহর যমিন অনেক বিস্তৃত। আল্লাহ বলেন—

> (আমার এ কথাটি) বলে দাও, হে আমার বান্দারা, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো। যারা এ দুনিয়ায় সৎকাজ করে তাদের জন্য কল্যাণ আছে। আর আল্লাহর যমিন প্রশস্ত। ধৈর্যধারণকারীদের বিনা হিসাবে পুরোপুরি পুরস্কার দেওয়া হবে। [সূরা যুমার, ৩৯: ১০]

সূরা কাহফেও হিজরাতের আলোচনা এসেছে। যে যুবকরা তাদের রবের ওপর পূর্ণ ঈমান এনেছে, নিজেদের মাতৃভূমি ছেড়ে গুহায় হিজরাত করেছে, তাদের কথা সবিস্তার আলোচনা করেছে সূরাটি। সাহাবিদের সামনে হিজরাত সম্পর্কে কুরআনে বিধৃত এমন ঘটনা ও আলোচনা তাদের মনে দারুণভাবে দাগ কাটে। তাদের ঈমান আরও অবিচল হয়। তারা নিশ্চিত হন, আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে নিজ দেশ; এমনকি পরিবার-সংসার পর্যন্তও ছেড়ে দেওয়া যায়।

এরপর সূরা নাহ্‌লে কুরআন হিজরাত সম্পর্কে সরাসরি আলোচনা করেছে। আল্লাহ বলেন,

> নির্যাতিত হওয়ার পর যারা আল্লাহর জন্য হিজরাত করেছে, দুনিয়ায় আমি তাদের উত্তম বাসস্থান দেবো। আর আখিরাতের পুরস্কার তো আরও বড়, যদি তারা জানত! (এরা তারাই) যারা ধৈর্যধারণ করেছে ও তাদের রবের ওপর ভরসা করে। [সূরা নাহ্‌ল, ১৬: ৪১,৪২]

সূরাটির শেষদিকে হিজরাতের অর্থকে আরও ব্যাপক করে দেয় কুরআন। আল্লাহ বলেন:

> যারা নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর হিজরাত করেছে, তারপর জিহাদ করেছে ও ধৈর্য ধরেছে, (তাদের জন্য) এসব কিছুর পর অবশ্যই তোমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা নাহ্‌ল, ১৬: ১১০]

এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিমদের কাছে হিজরাত একটি পরিচিত বিষয় হয়ে ওঠে। এমন নয় যে, তারা বিষয়টিকে একেবারেই জানেন না। দেশ ছেড়ে পরিবার-পরিজন রেখে আবিসিনিয়ায় হিজরাত করার কার্যত একটা নজির মুসলিমদের সামনে ইতোমধ্যে রয়েছেও বটে।[১]

ইয়াসরিবে প্রস্তুতি

প্রথম খণ্ডের আলোচনাগুলো খেয়াল করলে দেখব যে, শুরুর সেই দিনগুলো থেকে রাসূল ﷺ আনসারদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে কোনোরকম তাড়াহুড়ো করেননি। দুবছরেরও বেশি সময় অপেক্ষা করেছেন। যখন তিনি নিশ্চিত যে, সেখানে নেতৃত্বের অনুকূল ভালো একটা বলয় গড়ে উঠেছে এবং একই সঙ্গে মাদীনায় মুস'আব ؓ-এর যাওয়ার কারণে পরিবেশটাও হয়ে উঠেছে কুরআনময়, তখনই তিনি হিজরাতের বিষয় নিয়ে ভাবেন।

তা ছাড়াও রাসূল ﷺ আরও নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, মাদীনার আনসার সাহাবিদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। ইয়াসরিবের পরিবেশ অনুকূলে হওয়ায় আনসাররাও আল্লাহর রাসূলকে তাদের কাছে হিজরাত করার আর্জি পেশ করেন। এ প্রস্তুতি তো আছেই, তারও আগে আকাবায় আল্লাহ্‌র রাসূলের সঙ্গে আনসারদের এসব বিষয়ে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা হয় এবং তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে আনুগত্যের শপথ নেন। সে সময় রাসূল ﷺ ইয়াসরিবে হিজরাত করে তাদের কাছে চলে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যে কারণে পরিকল্পনা অনুযায়ী তারাও প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাসূলের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে থাকেন। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—নিজ সন্তান ও পরিবার-পরিজনকে তারা যেসব বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন, রাসূল ﷺ-কেও তারা সেসব থেকে সুরক্ষা দেবেন। নবিজিকে কষ্ট দেয় যে মিনাবাসী ও কুরাইশরা, প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে যুদ্ধের মাধ্যমে ফায়সালার ব্যাপারেও সেদিন প্রচণ্ড আগ্রহী ছিলেন আনসার সাহাবিরা। কিন্তু রাসূল ﷺ সময়টাকে উপযুক্ত মনে করেননি বলে তাদের এমনটা করার অনুমতি দেননি; বরং তাদের বলেছিলেন, 'আমাদের এ বিষয়ে এখনো আদেশ দেওয়া হয়নি।'

এভাবেই আনসাররা মাক্কার মুহাজিরদের সাদরে বরণ ও তাদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য ইয়াসরিবকে উপযুক্ত করার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। যেন হিজরাতের কারণে মুশরিকদের পক্ষ থেকে কোনো বিপদ এলে শক্ত হাতে তা প্রতিহত করা যায়।[২]

হিজরাতের সূচনা

দীনের কল্যাণকামী ও আলোর পতাকাবাহী ইয়াসরিববাসী আল্লাহ্‌র রাসূলের হাতে বাই‘আত গ্রহণ করে ইসলামকে সুরক্ষা দানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। বিষয়টি জানার পর মুশরিকদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়। প্রচণ্ডভাবে কেঁপে ওঠে তারা। গোস্বায় মুসলিমদের ওপর নির্যাতন আরও বাড়িয়ে দেয়। নির্যাতনের এমন বেপরোয়া ভাব দেখে রাসূল ﷺ সাহাবাদের মাদীনায় হিজরাতের অনুমতি দেন। মাদীনা হিজরাতের উদ্দেশ্যই হলো—সেখানে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। যে রাষ্ট্র পৃথিবীর প্রান্তে দীনের দাওয়াত বয়ে নিয়ে যাবে। ইসলাম ও মুসলিম জাতির সুরক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়বে জিহাদে। মুসলিমদের ওপর হাত তোলার সাহস যেন কারও না থাকে এবং আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দীন ইসলামই যেন সব ব্যবস্থার ওপর বিজয় লাভ করে।[৩] আল্লাহ তা‘আলাই মাদীনায় হিজরাত করতে আদেশ করেছেন। ‘আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে ৭০ জন লোক যখন বাই‘আত নিয়ে গেলেন, তখন তাঁর অন্তর খুশিতে ভরে উঠল। আল্লাহ তাঁর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করলেন। রক্তে যুদ্ধের নেশা মিশে আছে, এমন এক জাতিকে তিনি আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন।

এদিকে মুসলিমদের হিজরাতের খবর পেয়ে মুশরিক সব দিশেহারা। তারা সাহাবিদের চারপাশ থেকে চেপে ধরল। সংকীর্ণ করে দিলো তাদের জীবনযাপন। নানা গালিগালাজ ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ করে তুলল তাদের জীবন। এই অসহনীয় জুলুমের কথা বলে সাহাবাগণ আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে হিজরাতের অনুমতি চান। রাসূল ﷺ বললেন, নিশ্চয় আমাকে তোমাদের হিজরাতের আবাসন দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী খেজুর বাগান বিশিষ্ট একটা ভূমি।

এরপর কয়েকদিন তিনি চুপচাপ থাকেন এবং একদিন খুব খুশি মনে সাহাবিদের কাছে এসে বললেন, নিশ্চয় আমাকে তোমাদের হিজরাতের স্থান জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর সেটা হলো ইয়াসরিব। তাই যারা আগ্রহী তারা যেন সেদিকে বেরিয়ে পড়ে।

আল্লাহ্‌র রাসূলের মুখ থেকে হিজরাতের অনুমতি পেয়ে মাক্কার মুসলিমরা প্রস্তুতি নিতে থাকেন। কাউকে কিছু জানতে না দিয়ে, কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই একে একে তারা মাদীনার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন।

সাহাবিদের মধ্যে মাদীনায় প্রথম এসে পৌঁছান আবু সালামা ইবনু ‘আবদুল আসাদ। এরপর আসেন আমির ইবনু রাবী‘আহ , সঙ্গে স্ত্রী লাইলা বিনতে আবু হাস্‌মাহ; তিনি মাদীনায় পালকিতে চড়ে আসা প্রথম নারী। তারপর দলে দলে সাহাবিরা মাদীনায় আসেন। মাদীনায় এসে তারা আনসারদের বাড়িতে ওঠেন। আনসাররাও তাদের সাদরে সম্ভাষণ জানান, নানাভাবে সাহায্য করেন। রাসূল ﷺ পৌঁছার আগেই আবু হুযাইফার মুক্ত দাস সালিম رضي الله عنه মুহাজিরদের নিয়ে কুবায় ইমামতি করে সালাত আদায় করেন।

মাদীনার উদ্দেশে মুসলিমদের হিজরাতের খবর শুনে কুরাইশদের ক্ষোভ তখন চূড়ান্ত মাত্রায়। বংশের যেসব যুবকের হিজরাতের খবর পেয়েছিল, তাদের ওপর নৃশংসভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা।

এর আগে আনসারদের একদল মুসলিম যুবক আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে দ্বিতীয় আকাবার বাই‘আত অনুষ্ঠানে আনুগত্যের শপথ নিয়ে নিজ এলাকা মাদীনায় ফিরে যান। মুহাজির সাহাবিদের প্রথম দল যখন হিজরাত করে কুবা মাসজিদে এসে পৌঁছান, একই সময়ে আনসারদের কয়েকজন মাদীনা থেকে বের হয়ে আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে মাক্কায় আসেন। পরে আবার সেখান থেকে মাক্কার মুহাজিরদের সঙ্গে তারাও হিজরাত করে মাদীনার দিকে রওনা দেন; এরই মধ্য দিয়ে তারা একই সঙ্গে আনসার ও মুহাজির হয়ে যান। সংখ্যায় তারা খুব বেশি ছিলেন না। যাকওয়ান ইবনু ‘আব্‌দ কাইস, ‘উকবাহ ইবনু ওয়াহাব ইবনু কিলদাহ, আব্বাস ইবনু ‘উবাদাহ ইবনু নাদ্‌লাহ, যিয়াদ ইবনু লাবীদ رضي الله عنه প্রমুখ। মুসলিমরা সবাই মাদীনার উদ্দেশে হিজরাতে বেরিয়ে পড়েন। রাসূল ﷺ, আবু বাক্‌র رضي الله عنه, ‘আলি رضي الله عنه, আর অসুস্থ অথবা বের হতে অক্ষম এমন কয়েকজন ছাড়া মাক্কায় আর কোনো মুসলিম ছিলেন না।[৪]

মুহাজির মুসলিমদের আটকাতে কুরাইশদের নানা অপচেষ্টা

হিজরাত না করে তখনো যে মুসলিমরা মাক্কায় রয়ে গেছেন, তাদের আটকাতে এমন কোনো চেষ্টা নেই যা কুরাইশ নেতারা করেনি। তারা যেসব চক্রান্ত করেছে, তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো:

১। স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের আলাদা করে ফেলা:

আমরা প্রথম খণ্ডে উম্মুল মু’মিনীন উম্মু সালামা, হিন্‌দ বিনতে আবু উমাইয়া নিজের ও তার স্বামী আবু সালামার হিজরাতের সময় ঈমানের অবিচলতার কথা

৬

রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীকের হিজরাত

রাসূল ﷺ-ও আবু বাক্‌র সিদ্দীকের হিজরাত

রাসূল ﷺ-কে গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র:

সব ধরনের কুৎসিত শক্তির দাপট প্রদর্শন ও নোংরা অপচেষ্টা চালানোর পরও যখন মুশরিক-কুরাইশরা সাহাবিদের মাদীনায় হিজরাত থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি, তখন নিজেদের অবস্থার ভঙ্গুরতা তারা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে যায়। দু ধরনের আশঙ্কা তাদের পেয়ে বসে; রুটিরুজির বন্দোবস্ত করার জন্য তাদের বছরে দুটি বাণিজ্যিক সফর করতেই হয়। মাদীনার পাশ দিয়েই সমস্ত সামানাপত্তর আর লোক-লস্করের বহর নিয়ে যাতায়াত করতে হয়, দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। যেহেতু মাদীনা এখন মুসলিমদের হাতে, তাদের আশঙ্কা—মুসলিমরা সুযোগ বুঝে হামলে পড়বে তাদের বহরে। দ্বিতীয় যে আশঙ্কা তাদের মনে দানা বাঁধে, সারা আরবে, আরব উপদ্বীপে, কুরাইশদের যে একচ্ছত্র মোড়লিপনা চলে আসছিল এতদিন ধরে, তা বুঝি শেষ হতে চলল। দিশেহারা হয়ে বর্তমান কর্তব্য ঠিক করার জন্য নেতারা গিয়ে জমায়েত হয় তাদের পরামর্শগৃহ 'নাদওয়ায়'; কীভাবে মুসলিমদের অবিসংবাদিত নেতা মুহাম্মাদ ﷺ-কে আটকানো যায়, সে নিয়ে চলে আলোচনা। তাদের ষড়যন্ত্র পাকানোর এ কথা আল্লাহ কুরআনে এভাবে উল্লেখ করে বলেন—

> (স্মরণ করো) যখন কাফিররা তোমাকে বন্দি করার জন্য অথবা হত্যা করার জন্য কিংবা (মাতৃভূমি থেকে) বের করে দেওয়ার জন্য তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল; আল্লাহও কৌশল করছিলেন। আর আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী। [সূরা আনফাল, ৮: ৩০]

আয়াতটির ব্যাখ্যায় সাহাবি ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه বলেন, কুরাইশরা মাক্কার পরামর্শগৃহে একে একে পরামর্শ দিতে থাকে। তাদের কেউ কেউ বলল, সকাল হলে

গলায় শিকল পরিয়ে তাঁকে আটকে রাখো। অন্য কয়েকজন দ্বিমত পোষণ করে বলল, না, বরং তাঁকে হত্যা করো। বাকিরা বলল, না তা-ও না, এর চেয়ে ভালো তোমরা তাকে বের করে দাও। শেষ পর্যন্ত হত্যা করার সিদ্ধান্তই গৃহীত হলো। আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্রের আদ্যোপান্ত তার নবি ﷺ-কে অবহিত করেন। সে রাতে আলি আল্লাহ্‌র রাসূলের বিছানায় শুয়ে পড়েন।[৫৯] আর রাসূল ﷺ ঘর থেকে বেরিয়ে যান। সকাল বেলায় মুশরিকরা আল্লাহ্‌র রাসূলের বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে। গিয়ে তো তাদের চক্ষু ছানাবড়া; সেখানে রাসূল ﷺ নেই। তাঁর বিছানায় শুয়ে আছেন আলি ؓ। আলিকে দেখেই তারা বুঝে ফেলে আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্রের কথা মুহাম্মাদ ﷺ-কে জানিয়ে দিয়েছেন। আলিকে উদ্দেশ্য করে তারা বলে, তোমার এ সাথি কোথায়? আলি ؓ সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন, আমি জানি না। সুতরাং রাসূল ﷺ-কে ঘরে না পেয়ে তাঁর পায়ের ছাপ অনুসরণ করে তারা পাহাড়ের কাছে এসে থামে; কিন্তু এখানে এসে তারা দ্বিধায় পড়ে যায়। আশপাশের সবকিছু আরও ভালো করে দেখার জন্য এবার তারা পাহাড়ে গিয়ে ওঠে। এরপর একটা গুহার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পায় মাকড়সা গুহার মুখে বসে বসে জাল বুনছে। নিজেরাই বলে উঠল, তিনি যদি এখানে প্রবেশ করতেনই, তাহলে তো গুহার মুখে মাকড়সার জাল থাকার কথা না। অথচ রাসূল ﷺ সেই গুহার ভেতরেই ছিলেন এবং সেখানে তিনদিন অবস্থান করেন।[৬০]

রাসূল ﷺ-কে নিয়ে মুশরিকদের ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণনা সংবলিত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় প্রফেসর সাইয়িদ কুতুব বলেন, মাক্কার সার্বিক অবস্থার কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আয়াতগুলো। ভবিষ্যতের দৃঢ় অবস্থানের দিকেও ইঙ্গিত দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। আল্লাহ যে কাজ করেন, যে আদেশ করেন, এর পেছনে তাঁর পরিকল্পনা ও প্রজ্ঞার কথারও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় আয়াতগুলোতে...। প্রথম প্রজন্মের মুসলিমরা, কুরআনের প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তিগণ মাক্কা ও মাদীনা দুটি শহরের অবস্থার কথা ভালো করেই জানতেন; এ জানাটা কারও কাছ থেকে ধার করা নয়; নিজেরা থেকেছেন, দেখেছেন এবং চলতে-ফিরতে অর্জন করা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান তাদের। বর্তমান অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে মাদীনায় মুসলিমরা যে খুব নিশ্চিন্ত ও নিরাপদে আছেন—কথাটি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের নিকট অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল; কী অস্থিরতায়, কী ভয়াবহতার মধ্য দিয়েই না তারা একটা দীর্ঘ সময় পার করেছেন মাক্কায়। দাওয়াহর কাজ থেকে রাসূল ﷺ-কে নিবৃত্ত করতে পদে পদে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে, বাধা দিয়েছে। চেষ্টা করেছে রাসূল ﷺ-কে মেরে

ফেলার; কিন্তু আজ তারা মুশরিকদের সব বাধা ডিঙিয়ে পরিত্রাণই পায়নি কেবল, বরং তারা মুশরিকদের ষড়যন্ত্রের সব পথ বন্ধ পর্যন্ত করে দিয়েছে।

মুশরিকরা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল রাসূল ﷺ-কে গলায় রশি প্যাঁচিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত বন্দি করে রাখার। বুদ্ধি পাকাচ্ছিল কীভাবে রাসূল ﷺ-কে হত্যা করে তাঁর প্রভাব থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। কিংবা মাক্কা থেকে তাঁকে চিরদিনের নির্বাসনে পাঠানো যায়...। পরামর্শ সভায় মুশরিকরা দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রস্তাবিত প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করে। শেষ পর্যন্ত রাসূল ﷺ-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গর্হিত কাজটির জন্য তারা মাক্কার প্রতিটি গোত্র থেকে একজন করে সুঠামদেহী যুবককে বেছে নেয়। যেন রাসূল ﷺ-কে হত্যার দায় কোনো একটি গোত্র কিংবা কোনো একক ব্যক্তির ওপর না চাপে। আল্লাহ্‌র রাসূলের বংশ বনু হাশিম সারা আরবের বিরুদ্ধে একা লড়তে পারবে না। বাধ্য হয়েই তারা আপসে আসবে; রক্তপণ নিয়েই থাকবে সন্তুষ্ট। বিষয়টি সেখানেই খতম হবে বিবেচনা করে তারা এই সিদ্ধান্ত নেয় এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

আল্লাহর বাণী—

> তারাও চক্রান্ত করছিল আর আল্লাহও কৌশল করছিলেন। [সূরা আনফাল, ৮: ৩০]

কঠিন একটা চিত্র আয়াতটি চিত্রায়ণ করছে আমাদের সামনে। একই সঙ্গে সেটি ভীতিপ্রদও বটে। কী করে কৃশকায়, দুর্বল মানুষেরা মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর শক্তির সামনে দাঁড়ানোর স্পর্ধা দেখায়, যিনি তাঁর বান্দাদের ওপর এক মহাপরাক্রান্ত সত্তা। তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন অত্যন্ত সুনিপুণভাবে এবং সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন কেবল তিনিই।[৬১]

হিজরাতের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রস্তুতি:

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা رضي الله عنها বলেন, দিনের দুই প্রান্ত ভাগের একটিতে; সকাল কিংবা সন্ধ্যায়, আবু বাক্‌র رضي الله عنه-এর বাসায় রাসূল ﷺ আসতেনই, কখনো ব্যত্যয় হতো না; কিন্তু যেদিন রাসূল ﷺ-কে হিজরাত করতে বলা হয়, কেবল সেদিনই এ নিয়মের হেরফের ঘটে; তিনি সেদিন আমাদের কাছে এসেছিলেন দ্বিপ্রহরের কিছু পরে। সাধারণত তিনি এ সময়টাতে আসেন না। আবু বাক্‌র رضي الله عنه তাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ তো সাধারণত এ সময়টাতে আসেন না, গুরুত্বপূর্ণ

কিছু হয়েছে বলেই তিনি এসেছেন।

রাসূল ﷺ ঘরে প্রবেশ করলে আবু বাক্‌র رضي الله عنه তাকে বসতে দিলেন। রাসূল ﷺ বললেন, ঘরের লোকদের একটু দূরে যেতে বলো। আবু বাক্‌র رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এরা তো অন্য কেউ না, আমারই দুই মেয়ে। আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আপনার কী হয়েছে? রাসূল ﷺ বললেন, আমাকে মাক্কা ছেড়ে হিজরাত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আবু বাক্‌র رضي الله عنه জানতে চান, সাহচর্য, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ? রাসূল ﷺ জানালেন, সাহচর্য। সেদিন (আমার পিতা) আবু বাক্‌রকে না দেখলে আল্লাহর কসম, আমি হয়তো জানতেই পারতাম না যে, খুশিতে কেউ এভাবে কাঁদতে পারে। আবু বাক্‌র رضي الله عنه এরপর বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এই উট দুটিকে এ সফরের জন্যই আমি প্রস্তুত করে রেখেছিলাম। উট দুটির ইজারা নেয় বনু দুওয়াইল ইবনু বাক্‌র গোত্রের ‘আবদুল্লাহ ইবনু উরাইকিত নামের এক মুশরিক ব্যক্তি। তার মা সাহম ইবনু ‘আমর গোত্রের একজন মহিলা। তিনি উট দুটির দেখভালের দায়িত্ব লোকটার হাতে তুলে দেন। সে সেগুলো নিজের কাছে রেখে যথাসময়ের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিল।[৬২]

সফরের জন্য আমরা উট দুটিকে যথাসম্ভব দ্রুত প্রস্তুত করে ফেলি এবং তাদের জন্য একটা সুফরাহ (খাবারের কাজে ব্যবহৃত এক ধরনের মাদুর) তৈরি করে বস্তায় ভরি। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র رضي الله عنها তার কোমর বন্ধনীর একটা অংশ কেটে নিয়ে বস্তার মুখ শক্ত করে বাঁধেন। এ কাজের কারণেই তিনি ‘যাতুন-নিকাতাইন’ বা দুটি কোমরবন্ধনীর অধিকারিণী বলে সবার কাছে পরিচিতি পান । এরপর রাসূল ﷺ ও আবু বাক্‌র رضي الله عنه সাওর পাহাড়ের গুহার দিকে এগিয়ে যান। সেখানে তিন রাত আত্মগোপন করে থাকেন।[৬৩] আবু বাক্‌র সিদ্দীকের ছেলে ‘আবদুল্লাহ তখন তরুণ, চটপটে ও বুদ্ধিমান। রাতের বেলা সে তাদের দুজনের সঙ্গে গুহায় থাকত এবং সকাল হওয়ার আগেই মাক্কায় এসে হাজির। কুরাইশদের মাঝে এমনভাবে ঘুরে বেড়াত, যেন সে রাতে মাক্কাতেই ছিল। তাদের দুজনের বিরুদ্ধে মাক্কার যেখানেই কোনো ষড়যন্ত্রের কথা তার কানে আসত, রাতে গিয়ে সে খবর পৌঁছে দিত।

বিকাল গড়িয়ে একসময় অন্ধকারে ছেয়ে যায় চারপাশ। মরুভূমির বুকে সন্ধ্যা নামে। আরও বেশ পরে; ইশার এক ঘণ্টা পার হওয়ার পর চুপিসারে তাদের কাছে যেত আবু বাক্‌রের দাস ‘আমির ইবনু ফুহাইরাহ। ভেড়ার দুধ দোহন করে সে তাদের

দুজনকে পান করিয়ে আসে। ‘আমির সুবহে সাদিকের পূর্বক্ষণে ভেড়াগুলো হাঁকিয়ে ফিরে যায় মাক্কায়। ওই তিনদিন সে নিয়ম করেই তার কাজ করে।

‘আবদ ইবনু ‘আদি গোত্রের দুওয়াইল বংশের একজন দক্ষ লোককে নিজেদের গাইড হিসেবে ভাড়া করেন রাসূল ﷺ ও আবু বাক্‌র ؓ। এই বংশের সঙ্গে ‘আস ইবনু ওয়াইল আস-সাহমি বংশের মিত্রতা ছিল। লোকটা ছিল কাফির কুরাইশদের আচরিত ধর্মের অনুসারী। তা সত্ত্বেও তারা লোকটিকে বিশ্বাস করেন এবং নিজেদের ঘোড়ার লাগাম তার হাতে ছেড়ে দেন। তিন রাত পর তৃতীয় দিন সকালে তাদের ঘোড়া নিয়ে সাওর পাহাড়ের গুহার মুখে তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়ও নির্ধারণ করে দেন। তারা সফর শুরু করলেন, সঙ্গে ‘আমির ইবনু ফুহাইরাহ ও সেই গাইড। লোহিত সাগরের কোল ঘেঁষে যে পথটি মাদীনার দিকে এগিয়ে চলেছে, সে পথেই গাইড তাদের নিয়ে চলল।[৬৪]

গুহা অভিমুখে আল্লাহ্‌র রাসূলের পথ চলা:

মাক্কা ছেড়ে আল্লাহ্‌র রাসূলের চলে যাবার খবরটি ‘আলি, আবু বাক্‌র সিদ্দীক ও তার পরিবার ছাড়া আর কেউ জানত না।

‘আলি ؓ তো আল্লাহ্‌র রাসূলের ঘরেই ছিলেন। রাসূল ﷺ-ই তাকে আদেশ করেন থেকে যেতে। আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে মাক্কাবাসীর গচ্ছিত ধনসম্পদ যেন তিনি মালিকদের হাতে পৌঁছে দিতে পারেন। মাক্কার লোকেরা আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে তাদের সম্পদ গচ্ছিত রেখে নিশ্চন্ত হতো। তারা জানত, জগতের পরম বিশ্বস্ত মানুষটির কাছ থেকে তার সম্পদ খোয়ানোর কোনো ভয় নেই।[৬৫] আলি ؓ-কে সবার আমানত বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে আবু বাক্‌রের ঘর থেকে;[৬৬] প্রায় মধ্যরাতে তারা দুজন বেরিয়ে পড়েন অত্যন্ত গোপনে, টের পেয়ে কুরাইশরা যেন পিছু না নিতে পারে এবং হিজরাতের মতো বারাকাহপূর্ণ এক সফর থেকে তাদের আটকাতে না পারে।

মাক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় নবিজির বেদনা:

মাক্কা থেকে হিজরাত করে মাদীনায় যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাযওয়ারাহ নামক মাক্কার একটা জায়গায় একটু দাঁড়ান। বলেন, হে মাক্কা, আল্লাহর শপথ, আল্লাহর যমিনের শ্রেষ্ঠ অংশ তুমিই, আল্লাহর যমিনের মধ্যে

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে তুমিই প্রিয়। আমাকে যদি তোমার বুক থেকে বের করে দেওয়া না হতো, তাহলে আমি কখনোই তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।[৬৭]

এরপর রাসূল ﷺ ও তার প্রিয় সাহাবি এগিয়ে চললেন। মুশরিকদের পাকড়াও ও নজরদারি থেকে আল্লাহ তাদের দুজনকে নিরাপদে পার করেন।

রাসূল ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলার সুরক্ষা দান:

মাদীনায় হিজরাত করার পথ নিরাপদ করার জন্য রাসূল ﷺ জাগতিক সব ধরনের প্রস্তুতিই গ্রহণ করেন। তবে এমন নয় যে, জাগতিক প্রস্তুতির ওপরই তাঁর নির্ভরতা ছিল; বরং পূর্ণ আস্থা ছিল আল্লাহর ওপর। আশা ছিল—তাঁর কাজে আল্লাহ সাহায্য করবেন, তাঁকে সমর্থন করবেন। সাহায্য কামনা করে আল্লাহর কাছে দু'আ করেন; দু'আর কথাগুলো আল্লাহই তাঁকে শিখিয়েছেন;[৬৮] আল্লাহ বলেন—

> বলো, হে আমার রব, আমাকে ভালোভাবে প্রবেশ করান এবং ভালোভাবে বের করুন। আর আমার জন্য আপনার পক্ষ থেকে এক সহায়ক শক্তির ব্যবস্থা করুন। [সূরা ইসরা, ১৭: ৮০]

কুরআনের এই আয়াতে রয়েছে, এমন একটি দু'আ যা আল্লাহ তাঁর নবিকে শিখিয়েছেন, যেন তিনি এর মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকেন। আল্লাহর কাছে দু'আ করার জন্য তাঁর উম্মাহকেও যেন শিখিয়ে দেন। এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়— এক. যে দেশের অধিবাসীরা সত্যকে ভলোবাসে, সেখানে প্রবেশ করানোর কথা আছে। দুই. আর যেখান থেকে বের হওয়া প্রয়োজন, সেখান থেকে বের করে আনার কথাও আছে। মোটকথা, সফরের আগাগোড়া যাতে নিরাপদ হয় এবং সফরসঙ্গীরা যেন দীনের জন্য একনিষ্ঠ হন, সেই দু'আও আছে। সফরটির শুরু-শেষ, প্রথম ও পরের ধাপগুলো এবং এর মাঝের যতগুলো পদক্ষেপ আছে, সব নিরাপদে শেষ হয়।

সত্যের রয়েছে উপযুক্ত একটি মূল্য; এ মূল্যকে অবমূল্যায়ন করার জন্য মুশরিকরা নানান ফন্দি-ফিকির আঁটে। আল্লাহকে উপাস্য না মেনে নিজেদের মনগড়া দেবদেবীকে তারা উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল এবং এর জন্য তারা নিজেদের জানমাল বাজি রেখেছিল। মনে করেছিল এতে করে তারা নবি ﷺ-কে ঘাবড়ে দিতে পারবে; কিন্তু আল্লাহ তাদের সব অপকর্মের কথাই তার নবিকে জানিয়ে দেন। সত্যকে কে না ভালোবাসে? সমাজের বুকে সত্য ঠাঁই পেয়েছে বিশেষ এক স্থানে; যে সমাজে